সামাজিক ভীতি

বাংলায় সাইকোএডুকেশন-এর কোন পরিভাষা নেই। বোঝার সুবিধার্থে, একে বলা যেতে পারে মনোরোগ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা বা জ্ঞান। মনোরোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে সাইকোএডুকেশনের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি একটি বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি, যার মাধ্যমে রোগের ধরন, লক্ষণ, কারণ, চিকিৎসা, পরিণতি এবং পরবর্তীতে একই সমস্যা দেখা দিলে করণীয় কী সে সম্পর্কে রোগী ও তার পরিবারকে অবগত করা যায়। এতে করে রোগীর পরিবার মানসিক রোগের চিকিৎসার গুরুত্ব বুঝতে পারে এবং রোগী ফিরে যেতে পারে স্বাভাবিক জীবনে।

আমাদের দেশে মানসিক রোগের সাথে এখনও জড়িয়ে আছে কুসংস্কার ও লোকলজ্জা। এটাও যে আর দশটি শারীরিক রোগের মতোই একটি রোগ তা অনেকেরই অজানা। আর তাই তারা দিশেহারা হয়ে ছুটে বেড়ান কবিরাজ, পীর, ফকিরদের কাছে পানি পড়া আনতে। এ ধরনের পরিবার ও ব্যক্তিকে মানসিক রোগ সম্পর্কে ধারণা দেওয়াই সাইকোএডুকেশনের উদ্দেশ্য। আমাদের দেশে শতকরা ১৬.০৫% লোক মানসিক রোগে আক্রান্ত। বেশির ভাগেরই ধারণা, এ রোগ একবার হলে আর ভালো হয় না। অথচ, অনেকেই জানেন না যে যথাসময়ে, সঠিকভাবে রোগনির্ণয় ও সঠিক চিকিৎসা প্রদান করা হলে, রোগী সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারে।

মানসিক রোগের ক্ষেত্রে সাইকোএডুকেশনের গুরুত্ব বিবেচনা করে অন্যতম একটি মানসিক রোগ Social Phobia বা সামাজিক ভীতির কারণ, ধরন, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে একটি সাইকোএডুকেশনাল পাঠ তৈরি করা হলো। আশা করি, যারা এই সমস্যায় ভুগছেন এবং অনেক প্রশ্ন, বলতে না পারা কথা মনে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তারা কিছুটা হলেও উপকৃত হবেন।

সামাজিক ভীতি কী?

ব্যক্তি যখন কোন সাক্ষাৎকার, প্রেজেন্টেশন (presentation) বা অন্য কোন প্রয়োজনে সামাজিক পরিবেশে যেতে চরম মাত্রায় ভয় পেয়ে পরিস্থিতিকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং ভাবতে থাকে যে ওই পরিবেশে সবাই তাকে নিয়ে মন্তব্য করছে, তাকে খারাপভাবে মূল্যায়ন করছে তখন তাকে সামাজিক ভীতি বলে। সামাজিক ভীতি মানসিক রোগগুলোর মধ্যে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। কাজেই, এ সমস্যা কেবল আপনার বা আপনি একাই এ রোগে ভুগছেন, এটা ভাবার কোন কারণ নেই। এ রোগের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ব্যক্তি সামাজিক পরিবেশে যেতে ভয় পায়; সে মনে করে, প্রত্যেকে তাকে খুব মনোযোগ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে আর তার প্রত্যেকটি আচরণ, কথাবার্তা, কাজকর্মের খারাপ মূল্যায়ন করছে। তখন তার কিছু অস্বস্তিকর অনুভূতি হয়। এই অস্বস্তিকর অনুভূতি লুকাতে বা অন্যরা যেন না দেখে সেজন্য সে কিছু আচরণ করতে বাধ্য হয়। নীচে একটি বাস্তব উদাহরণ দেওয়া হলো, যা থেকে বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে -

ছোট একটি বইয়ের দোকানে কাজ করে ২৬ বছর বয়সী তুলি নামের একটি মেয়ে। সে Anxiety Treatment and Research Centre-এ আসে তার কিছু অশান্তি, অস্বস্তি বা উদ্বেগের কারণে। তার হবু বরের সাথে তার চার বছরের পরিচয় এবং বিয়ে নিয়ে তার কোন ভয় বা লজ্জা নেই। তারপরও ইতোমধ্যে দুবার বিয়ের তারিখ পেছানো হয় তার ইচ্ছামতো। এর একটি কারণ হলো, বিয়ের অনুষ্ঠানকে ঘিরে সে প্রচণ্ড রকম ভয়, উদ্বেগ বা লজ্জা অনুভব করে। সে ভাবে, বিয়েতে এত মানুষ আসবে, আমাকে মাঝখানে সেজেগুঁজে বসতে হবে, সবাই আমাকে নিয়ে কী ভাববে, সবাই কী বলবে ইত্যাদি। তার এ ধরনের ভয় শুরু হয় অনেক কম বয়সে, যখন সে স্কুলে পড়ত। তখন ভয় এতটাই তীব্র ছিল যে এ কারণে তার পড়াশোনার ক্ষতি হয়। সে ভালো ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও, ভাবতো সহপাঠীরা তাকে বোকা, একঘেঁয়ে, নিরস ভাবছে, তাকে অযোগ্য ভাবছে। যেসব ক্লাসে শিক্ষকরা হোমওয়ার্ক-এর ওপর প্রশ্ন করতো বিভিন্নভাবে সেই ক্লাসগুলো না করার চেষ্টা করতো সে। আর, ক্লাস করলেও যখন তাকে পড়া জিজ্ঞাসা করা হতো, সে কিছুই বলতে পারতো না। কারণ, সে ভাবতো, সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে আর তাকে নিয়েই কথা বলছে। শ্রেণী উপস্থাপনার সময় সে বিশেষ অনুমতি নিয়ে লিখিতভাবে উপস্থাপন করতো। ক্লাসে সব সময় চুপচাপ থাকতো, কারো সাথে কথা বলতো না। দলগত পড়াশোনায়ও অংশ গ্রহণ করতো না। কলেজে উঠেও তুলি একই ধরনের সমস্যায় পড়ে। বন্ধুরা কোন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানালে, সে যেতো না। যদিও কোথাও যেতে বাধ্য হতো, সেখানে দেরিতে উপস্থিত হতো ও নানা অজুহাত দেখিয়ে আগে বের হয়ে আসতো। তার পরিবারের সদস্য ও পুরনো কিছু বন্ধু-বান্ধবের সাথেই শুধু সে স্বাভাবিক ছিল। অন্য সবাইকে সে এড়িয়ে চলতো। কলেজশেষে বইয়ের দোকানে কাজ নেওয়ার পরও সে একই সমস্যা অনুভব করলো।

সামাজিক ভীতি নিয়ে তুলি অনেক সময় অতিক্রম করে এসেছে। এটি প্রতি পদক্ষেপে তার জীবনকে বাধাগ্রস্ত করেছে। এর আগে সে কখনও কোন সেবা গ্রহণ করে নি। তার হবু বরের অনুপ্রেরণায় সে সেবা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেবাকেন্দ্রে আসে। সেবাকেন্দ্রে এসে পূর্ণ মূল্যায়নের পর সে কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপির ১২টি সেশনের একটি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। ধীরে ধীরে সে এ ধরনের পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেয়ার শিক্ষা লাভ করে। এখন সে অনেক স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে।

তুলির এই গল্প অন্য আরো দশ জন, যারা সামাজিক পরিবেশে অতিরিক্ত লজ্জা, ভয়, অস্বস্তি বোধ করে, তাদের অভিজ্ঞতা থেকে ভিন্ন নয়। কগনিটিভ বিহ্যাভিয়ার থেরাপি (Cognitive Behaviour Therapy) ব্যক্তির খারাপ অনুভূতি, ভয়, উদ্বেগ, লজ্জা, অস্বস্তি সৃষ্টিকারী চিন্তার ধরন ও আচরণ সনাক্ত করে তাকে স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করতে শেখায়।

উপরের উদাহরণ থেকে সামাজিক ভীতি সম্পর্কে একটি ধারণা পেয়েছি। সামাজিক ভীতির অন্যতম কিছু লক্ষণ হচ্ছে:

(১) অপরিচিত বা পরিচিত সামাজিক পরিবেশে যেতে ব্যক্তি ক্রমাগত ভয় পায়। সে মনে করে, সে এমন কোন আচরণ করে ফেলবে, যার জন্য অপ্রস্তুত বা অপমানিত হতে পারে।

(২) সামাজিক পরিবেশে উপস্থিত হলে ব্যক্তির মধ্যে প্রচণ্ড উদ্বেগ লক্ষ করা যায় এবং মাঝে মাঝে প্যানিক এ্যাটাক হতে পারে (যেমন, দম বন্ধ হয়ে যাবে, এমন মনে হয়; ব্যক্তি ভাবে, সে মারা যাচ্ছে)।

(৩) ব্যক্তি বুঝতে পারে, ভয়টি অতিরিক্ত এবং অমূলক।

(৪) উদ্বেগ এড়ানোর জন্য ব্যক্তি সব সময় সামাজিক পরিস্থিতি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

(৫) ভীতিজনক পরিবেশে যাওয়ার আগে সেখানে কী ঘটতে পারে বা সেখানে গিয়ে কী করবে সে বিষয়ে ভাবতে বা পূর্বানুমান করতে থাকে, যা সাধারণ দৈনন্দিন জীবনযাপন, পড়াশোনা, সামাজিক ও পেশাগত কাজকর্মকে বাধাগ্রস্ত করে।

(৬) এ ধরনের লক্ষণ সাধারণতঃ ১৮ বছর বয়সের পর দেখা যায়। তবে যদি অন্য কোন শারীরিক/মানসিক অসুস্থতার কারণে সামাজিক ভীতি দেখা দেয় তবে তাকে সামাজিক ভীতি বলা যাবে না।

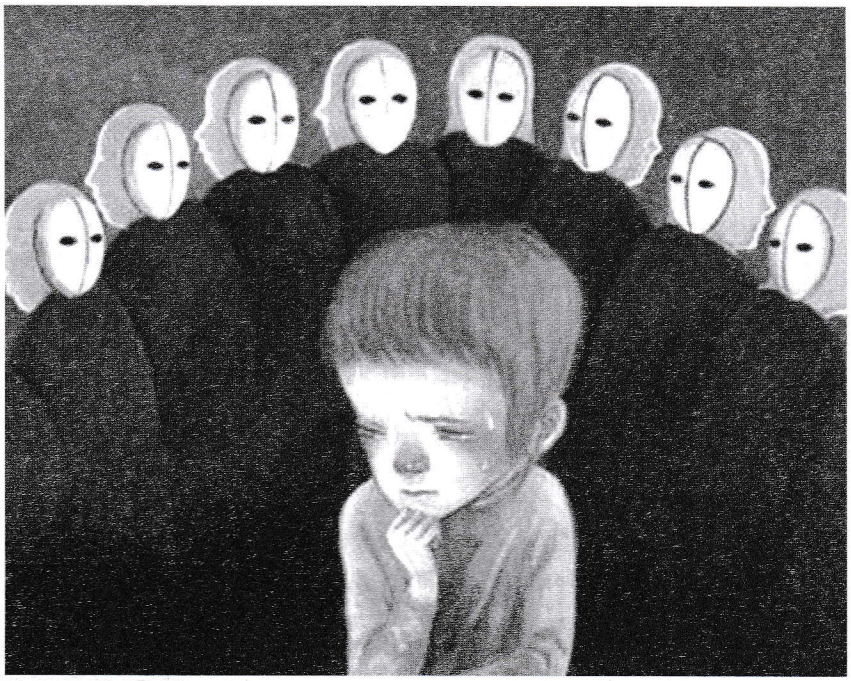

কারণ

সামাজিক ভীতির যে লক্ষণগুলো সচরাচর দেখা যায় তার পেছনে কিছু কারণ লক্ষ করা যায়। কারণগুলো নীচে দেওয়া হলো।

(১) জিন: সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে সাধারণ উদ্বেগ ও সামাজিক পরিস্থিতিতে উদ্বেগ বংশগতভাবে বিস্তার লাভ করে। ব্যক্তির পূর্বপুরুষদের কারো এ সমস্যা থাকলে তার মধ্যে এটি হওয়ার প্রবণতা বেশি।

(২) মস্তিষ্ক: মস্তিষ্কের এমিগডালা ও নিউরোট্রান্সমিটারের কিছু সমস্যার জন্য এ রোগ হতে পারে।

(৩) দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা: আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা এবং এগুলোর প্রতিক্রিয়া সামাজিক পরিস্থিতিতে উদ্বেগ তৈরিতে সহায়তা করে। ব্যক্তি যদি বার বার একই ধরনের খারাপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং বার বার খারাপভাবে মূল্যায়িত হয় তবে তা এ রোগ তৈরিতে সহায়তা করে। দৈনন্দিন জীবনের অনেক পরিস্থিতি আছে যেগুলো ব্যক্তিকে এ অবস্থায় নিয়ে যায়।

(৪) মনোবৈজ্ঞানিক কারণ:

ক. নিগেটিভ অটোম্যাটিক থট: নিজের সম্পর্কে সব সময় খারাপ চিন্তা করার প্রবণতা ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক ভীতি তৈরিতে সহায়তা করে। 'আমি খারাপ, আমি অযোগ্য, আমাকে কেউ ভালোবাসে না, আমাকে দিয়ে কিছু হবে না' - ব্যক্তি যখন এ ধরনের চিন্তা করতে শুরু করে তখন তার মধ্যে ধীরে ধীরে সামাজিক ভীতির লক্ষণ প্রকাশ পায়।

খ. শৈশবে সামাজিক পরিবেশে অবাধ বিচরণে বাধা দেওয়া হলে সামাজিক দক্ষতা অর্জন বাধাগ্রস্ত হয়।

গ. বাবা-মা কম বয়সে সব কিছুতে বাধা দিলে, খুব বেশি আগলে রাখলে, সব সময় নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করলে ব্যক্তির মধ্যে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি দেখা দেয়, যা পরবর্তীতে সামাজিক ভীতি তৈরি হতে সাহায্য করে।

ঘ. ছোটবেলার লজ্জাজনক অভিজ্ঞতা প্রাপ্তবয়সে সামাজিক ভীতির উদ্রেক করে।

ঙ. ব্যক্তি যদি কোন পরিস্থিতিতে একবার কাউকে অবমূল্যায়িত হতে বা ভয় পেতে দেখে, সেখান থেকে নিজের মধ্যে ভয় ঢুকে যায় যে সেও ওই ধরনের পরিস্থিতিতে অবমূল্যায়িত হতে পারে।

চ. পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছ থেকে সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে ভুল তথ্য গ্রহণ করার ফলে সামাজিক ভীতি তৈরি হতে পারে।

ব্যক্তির চিন্তা কীভাবে সামাজিক পরিবেশে অস্বস্তি তৈরিতে সাহায্য করে তা একটি মডেল ও উদাহরণের সাহায্যে নীচে ব্যাখ্যা করা হলো

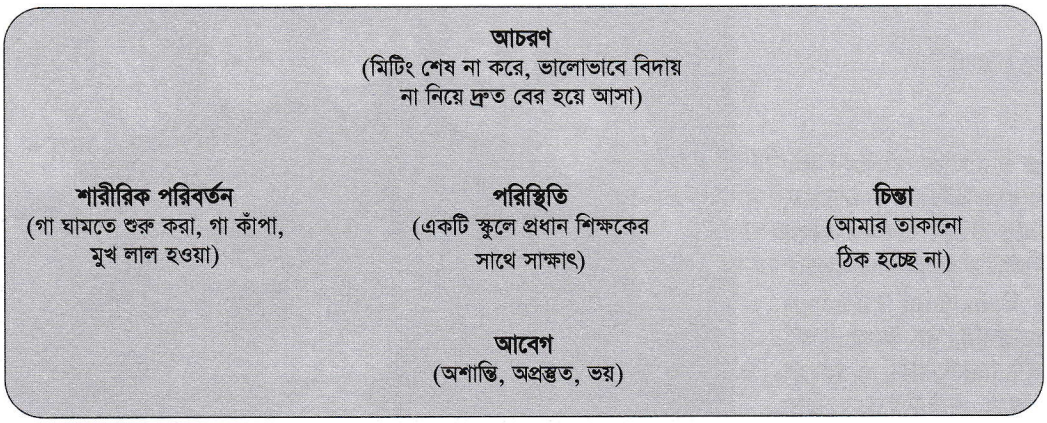

সামাজিক ভীতিতে যারা ভুগছেন তারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশি উদ্বেগ বোধ করেন। এরকম কিছু পরিস্থিতি ও ঘটনা নীচে উল্লেখ করা হলো।

১. উচ্চপদস্থ কারো সাথে কথা বলা বা সাক্ষাৎ করার প্রয়োজন হলে।

২. কেউ কোন কথা বলতে আসলে অথবা নিজ থেকে কারো কাছে কোন কিছু জানার প্রয়োজন হলে।

৩. কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে (যেমন বিয়ে, জন্মদিন, ঈদ প্রভৃতিতে) গেলে; বন্ধুদের সাথে খাবার খেতে গেলে।

৪. নতুন কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে হলে বা টেলিফোনে কথা বলার সময়।

৫. নিজের মত বা প্রয়োজন প্রকাশ করার সময়; নিজের ইচ্ছা কাউকে বলতে গেলে।

৬. চাকুরির ইন্টারভিউ দিতে গেলে; কারো সাথে দৃষ্টি বিনিময়ের সময়।

৭. রেস্টুরেন্টে খাবারের অর্ডার দেওয়ার সময় বা খাবার ফেরত দেওয়ার সময়।

৮. কোন মিটিং বা জনসমক্ষে কিছু বলার সময়।

৯. খেলাধুলা করার সময় বা অন্যের সামনে বাদ্যযন্ত্র বাজানোর সময়।

১০. নিজের কাজ অন্যকে দেখানোর সময়।

১১. কাউকে voice mail পাঠানোর সময়।

১২. বিয়ের অনুষ্ঠানে।

১৩. মঞ্চে অভিনয়ের সময়; ক্লাসে কোন প্রেজেন্টেশনের সময়।

১৪. অন্যের সামনে উচ্চস্বরে পড়ার সময়; অন্যের সামনে কিছু খাওয়া বা পান করার সময়; পাবলিক টয়লেট ব্যবহারের সময়; খুব ভিড়ের মধ্যে কোন দোকানে কেনাকাটার সময়।

ভীতিকর সামাজিক পরিস্থিতিতে ব্যক্তির মধ্যে যেসব সাধারণ উদ্বেগপূর্ণ চিন্তা কাজ করে নীচে তার কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো।

১. সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

২. তারা ভাবছে, আমি সব কিছু হারিয়েছি।

৩. আমি এই জায়গার যোগ্য নই।

৪. আমার কিছু বলার নেই, থাকতে পারে না।

৫. সবাই দেখছে আমি কত দুর্বল।

৬. এরা আমার সাথে আর কখনও কথা বলবে না।

৭. আমাকে চরম বোকা মনে হচ্ছে।

আর উদ্বেগপূর্ণ চিন্তা উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে ব্যক্তির মধ্যে যেসব শারীরিক প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে রয়েছে:

(১) মুখ লাল হয়ে যাওয়া, প্রচণ্ড ঘাম হওয়া, মাথা দিয়ে গরম ভাপ উঠা

(২) হৃদকম্পন দ্রুত হওয়া, মাংসপেশি শক্ত হওয়া

(৩) হাত-পা (কখনও পুরো শরীর) কাঁপা; গলায় কম্পন হওয়ার অনুভূতি

(৪) মুখ শুকিয়ে যাওয়া

(৫) শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া, জ্ঞানশূন্য অনুভূতি হওয়া

(৬) মাথা শূন্য লাগা, কথা ভুলে যাওয়া

(৭) ডায়রিয়া অথবা কোষ্টকাঠিন্য

(৮) চোখে সব সময় পানি থাকা; কোন কিছুতে মনোযোগ না থাকা

উদ্বেগপূর্ণ চিন্তার ফলে আচরণ অনেক সময় এরকম হয়ে থাকে:

(১) সামাজিক পরিস্থিতি এড়িয়ে চলা

(২) পরিস্থিতি দ্রুত ত্যাগ করা

(৩) নিরাপদ জায়গা ও নিরাপদ লোকজন খুঁজে বের করা

(৪) উদ্বেগ বোধ হলে বেশি বেশি মোবাইলে কথা বলা, গান শোনা

(৫) অন্যের সাথে কথোপকথন না করার জন্য বিভিন্ন ধরনের আচরণ করা

(৬) নিজেকে অপ্রয়োজনীয় কাজে জড়িয়ে ফেলা

(৭) সামান্য কোন অপরাধে অতিরিক্ত ক্ষমা প্রার্থনা করা

(৮) কোন কিছু করলে বা কোন প্রস্তুতি নিলে সব কিছু ঠিক আছে কিনা তা বার বার অন্যের কাছ থেকে শোনা

(৯) কোন কিছু বার বার তৈরি করা

(১০) অন্যরা যে তাকে নিয়েই কথা বলছে তার প্রমাণ খুঁজে বেড়ানো

উদ্বেগের মাত্রা যখন অতিরিক্ত হয়, পরিমিত মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, দৈনন্দিন কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, ব্যক্তি যখন সামাজিক পরিবেশ এড়িয়ে চলতে চলতে একসময় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অন্যের কাছেও সমস্যা হিসাবে ধরা পড়ে, নিজের প্রয়োজন না মিটিয়ে নিজেই ফাঁকিতে পড়ে, মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ তখন এটিকে সমস্যা বলে চিহ্নিত করেন।

রোগীর সংখ্যা

আমেরিকার এক গবেষণায় দেখা গেছে ৪০% ব্যক্তি জীবন চক্রের কোন না কোন সময়ে সামাজিক পরিস্থিতিতে কোন না কোন মাত্রায় উদ্বেগে ভোগে, ১৫% নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে আর ৫% কখনই কোন রকম উদ্বেগে ভোগে না। আর একটি গবেষণায় দেখা গেছে, মহিলারা পুরুষদের চেয়ে এই সমস্যায় বেশি আক্রান্ত হয়। অন্য একটি গবেষণায় জানা যায়, শতকরা ১২জন ব্যক্তি সামাজিক উদ্বেগে ভোগে।

সামাজিক পরিস্থিতিতে উদ্বেগ কি সবসময় খারাপ?

না, উদ্বেগ সবসময় খারাপ নয়, এটি সুস্থ ও স্বাভাবিক মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য জরুরি। কারণ, এটি আমাদের মন ও শরীরকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে সরিয়ে রাখে। উদ্বেগহীন মানুষ মৃত মানুষের তুল্য। পরিমিত মাত্রায় উদ্বেগ দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার সহায়ক।

কখন এটি সমস্যা?

উদ্বেগের মাত্রা যখন অতিরিক্ত হয়, পরিমিত মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, দৈনন্দিন কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, ব্যক্তি যখন সামাজিক পরিবেশ এড়িয়ে চলতে চলতে একসময় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অন্যের কাছেও সমস্যা হিসাবে ধরা পড়ে, নিজের প্রয়োজন না মিটিয়ে নিজেই ফাঁকিতে পড়ে, মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ তখন এটিকে সমস্যা বলে চিহ্নিত করেন।

সামাজিক ভীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কিছু বিশ্বাস খুব দৃঢ়ভাবে থাকে। সেসব বিশ্বাস থেকে তাদের সরানো খুব কঠিন। এ ধরনের কিছু বিশ্বাস হলো:

(ক) সবাইকে অবশ্যই আমাকে ভালোবাসতে হবে।

(খ) কেউ একজন যদি আমাকে অপছন্দ করে, এর অর্থ সবাই আমাকে অপছন্দ করে।

(গ) যে কেউ আমাকে প্রত্যাখান করতে পারে; কেননা, এটাই আমার প্রাপ্য।

(ঘ) আমার কথায় সবাইকে সব সময় অনন্দ পেতে হবে।

(ঙ) সবাইকে খুব আগ্রহ ও মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনতে হবে, মুখ কালো করে রাখা চলবে না।

(চ) আমাকে নিয়ে আমার পিছনে কেউ কোন কথা বলবে না।

(ছ) আমি কোন কাজ করতে গিয়ে ভুল করলেও কেউ কিছু বলবে না।

(জ) আমি কোন ভুল করলে সবাই আমার ওপর রাগ করবে।

(ঝ) আমি কোন প্রেজেন্টেশান করতে গেলে সবার কাছে বোকা প্রতিপন্ন হব।

(ঞ) আমি নার্ভাস হলে সবাই বুঝতে পারে।

(ট) সবাই আমাকে নার্ভাস, একঘেয়ে, বোকা, গাধা, অলস, অযোগ্য মনে করে।

(ঠ) সবাই ঠগ, কাউকে বিশ্বাস করা যায় না।

(ড) উদ্বেগের ফলে আমার যে শারীরিক পরিবর্তন হয় তা লুকোতে পারি।

(ঢ) অন্যের সামনে মুখ লাল হয়ে যাওয়া, শরীর কাঁপা বা ঘাম ঝরা খুবই বিরক্তিকর।

(ণ) কাজ করার সময় আমার হাত-পা কাঁপলে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যেতে পারে।

(ত) উদ্বেগ দুর্বলতার একটি লক্ষণ।

(থ) অন্যের সামনে আমি কখনও আমার দুর্বলতা প্রকাশ করব না।

(দ) আমি খুব বেশি উদ্বেগ বোধ করলে আমার কথা বলার ক্ষমতা থাকে না।

এ ধরনের দৃঢ় বিশ্বাস থেকে সরে এসে ব্যক্তি যদি একটু স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ নিম্নোক্তভাবে চিন্তা করতে পারে তাহলে সামাজিক ভীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

(১) আলোচনার বিষয়টি হয়তো তার পছন্দ হচ্ছে না, তারপরও আমার সাথে কথা বলছে।

(২) লোকটি ক্ষুধার্ত, তার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে।

(৩) লোকটি ব্যস্ত।

(৪) লোকটি হয়তো কোন কারণে লজ্জিত।

(৫) লোকটি সুস্থ নয়, তার শরীর খারাপ।

(৬) লোকটি কোন বিষয় নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আছে, তাই এভাবে কথা বলছে।

(৭) আমার সাথে কথা বলতে লোকটির ইচ্ছা হচ্ছে না। তারপরও আগ্রহ প্রকাশের সব রকম চেষ্টা করছে।

মেইনটেইনিং ফ্যাক্টর (Maintaining Factors)

সাধারণতঃ নিম্নোক্ত কারণে উপরোক্ত সমস্যাগুলো অব্যাহত থাকে।

ক. **সেফটি বিহ্যাভিয়ার (Safety Behaviour):** ভয়ে বা উদ্বেগে পরিস্থিতি এড়িয়ে যাওয়া বা পরিস্থিতি থেকে পালিয়ে যাওয়া খুব সাধারণ আচরণ। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি মনে করে, এভাবে সে ভীতিজনক পরিস্থিতি থেকে নিরাপদ থাকবে। কিন্তু, এরকম আচরণের ফলে সামাজিক ভীতি বরং আরো জেঁকে বসে। এসব আচরণকে বলা হয় safety behaviour বা নিরাপত্তা আচরণ, যার কিছু উদাহরণ নীচে দেওয়া হলো।

- যে কোন অনুষ্ঠানে সব সময় নীচের দিকে তাকিয়ে থাকা।
- বন্ধুরা কোন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করলে, বিভিন্ন দোহাই দিয়ে সেখানে উপস্থিত না হওয়া।
- ক্লাসে কোন প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া।
- যে কোন মিটিং-এ সব সময় দেরিতে উপস্থিত হওয়া ও মিটিং শেষ হওয়ার আগে দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে পড়া।
- বাড়িতে আসা অতিথিদের সাথে কথা না বলে অন্য কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা।
- বন্ধু বা সহকর্মীর সাথে কথা না বলার জন্য টেলিফোনে কথা বলার অভিনয় করা।
- অন্য রকম চিন্তা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা।
- Presentation-এর সময় ঘর অন্ধকার করে রাখা, যাতে দর্শক তার দিকে না তাকিয়ে slide-এর দিকে তাকিয়ে থাকে।
- কারো সাথে কথা বলার সময় তার চোখের দিকে না তাকিয়ে খুব ধীরে ধীরে কথা বলা।
- মুখের লালিমা আড়াল করতে সব সময় সাজগোছ করে থাকা।

খ. **সব কাজ নিখুঁতভাবে করার প্রবণতা (Perfectionism):** Antony (১৯৯৮) একটি গবেষণায় দেখতে পান, Social Phobia-য় আক্রান্ত ব্যক্তি সব কিছু খুব সুন্দর, ১০০% সঠিকভাবে করতে চায়, সবার সাথে ১০০% ভালো সম্পর্ক রাখতে চায়, সবার কাছে ১০০% ভালো থাকতে চায়। যখনই তাতে ব্যর্থ হয় তখনই উদ্বেগ কাজ করে।

গ. **বিষণ্নতা (Depression):** উদ্বেগের মাত্রা খুব বেড়ে গেলে ব্যক্তি আর ঘরের বাইরে যেতে চায় না, সব সময় ঘর অন্ধকার করে কোণে বসে থাকে, কথা বলে না কারো সাথে, কোনো কিছুতে আনন্দ পায় না। এক পর্যায়ে উদ্বেগ বিষণ্নতার রূপ নেয়। পূর্বে আলোচিত কিছু চিন্তা, যেমন, 'কেউ চায় না আমি বাইরে যাই', 'কেউ আমাকে ভালোবাসে না', 'কেউ আমাকে পছন্দ করে না' ইত্যাদি বিষণ্নতা তৈরিতে সাহায্য করে।

ঘ. **শরীর-সচেতনতা:** বুলিমিয়া নারভোসা বা এনোরেক্সিয়া নারভোসা-র মতো eating disorder-এ আক্রান্ত ব্যক্তি শারীরিক আকার-আকৃতি নিয়ে খুব বেশি দুশ্চিন্তায় ভোগে, ধীরে ধীরে বাইরে যাওয়া বাদ দিয়ে ঘরমুখী হয়ে পড়ে। Eating disorder এক পর্যায়ে সামাজিক ভীতিতে রূপান্তরিত হয়।

ঙ. **মাদক ব্যবহার (Substance Abuse):** সামাজিক অনুষ্ঠানে অনেকে বেশি মদ পান করে বা মাদক গ্রহণ করে নিজের অস্থিরতাকে লুকানোর চেষ্টা করে।

চ. **রাগ ও অন্যের প্রতি অবিশ্বাস:** রাগ ও অন্যের প্রতি চরম অবিশ্বাস থেকে সামাজিক পরিবেশে অস্বস্তি ও অস্থিরতার অনুভূতি সৃষ্টি হতে পারে এবং সেখান থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখার প্রবণতা এক সময়ে চরম ভয় ও উদ্বেগে পরিণত হয়।

চিকিৎসা

সামাজিক ভীতির চিকিৎসা প্রধানতঃ দুরকম হয়।

(১) **ঔষধ চিকিৎসা:** সামাজিক ভীতির চিকিৎসায় বেশ কিছু ঔষধ দেওয়া হয়, যা সেবন করলে ভীতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকে।

(২) **মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা:** বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যে মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা হচ্ছে Cognitive Behaviour Therapy (CBT). CBT মূলতঃ গুরুত্ব দেয় আমরা কী ভাবছি এবং কী করছি তার ওপর। এ থেরাপি প্রয়োগ করে চিন্তার ধরন ও আচরণ পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হয়। এ পদ্ধতিতে ব্যক্তির চিন্তাগুলো খুঁজে বের করে সেগুলোর পরিবর্তে নতুন, সঠিক চিন্তা করতে সাহায্য করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, ভুল চিন্তার কারণে ব্যক্তি যে আচরণগুলো করতে বাধ্য হতো সেগুলোর পরিবর্তে নতুন আচরণ করতে শেখানো হয়।

Social Skill Training: অনেক সময় দেখা যায়, ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক পরিবেশে মানিয়ে চলার মতো দক্ষতার ঘাটতি আছে। Social Skill Training-এর মাধ্যমে এসব দক্ষতা বাড়ানো হয়, যা সামাজিক ভীতি কমাতে সাহায্য করে। দলগতভাবে সোশ্যাল স্কিল ট্রেনিং, রোল প্লে, মডেলিং ও পোলিং সামাজিক ভীতি কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

সামাজিক ভীতিতে আক্রান্ত ব্যক্তির অতিরিক্ত চা বা কফি জাতীয় উদ্দীপক পদার্থ গ্রহণ ত্যাগ করা উচিত।

নিম্নোক্ত পরিস্থিতিগুলোতে বার বার উপস্থিত হতে থাকলে সামাজিক ভীতি কমে আসতে পারে। তাই, নিম্নোক্ত পরিস্থিতিগুলোতে নিজেকে উপস্থাপন করে দেখুন।

(১) একটি দলের সামনে কথা বলার সময় গা ঘামতে পারে, কাঁপতে পারে, লাল হতে পারে, কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া যাবে না।

(২) হঠাৎ অপরিচিত কোন ব্যক্তির সাথে কথা বলা শুরু করতে হবে।

(৩) সকলের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে থেকে কথা বলা বা শোনা।

(৪) নিজস্ব উদ্যোগে কোন প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করা।

(৫) কোন অনুষ্ঠানে বন্ধুদের সাথে থাকা এবং এমন কিছু করা যা দেখে সবাই খুব আনন্দ পায়।

(৬) কোন ভুল করা এবং লক্ষ করা তারপর কী ঘটে।

(৭) অনেক লোকের সাথে কথা বলা, অন্যের জন্য কাজ করা।

(৮) একদল অচেনা লোক অথবা উচ্চ পর্যায়ের কারো সাথে কথা বলা।

(৯) অন্যেকে সহযোগিতা করতে এগিয়ে যাওয়া।

(১০) সিনেমা দেখার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে টিকেট কাটা; সিনেমা হলে নিজের জায়গা খুঁজে বের করা।

(১১) খুব রাগী ব্যক্তির সাথে কাজ করা।

(১২) আমাকে নিয়ে সবাই যেন মজা পায় বা মজা করে, এমন জায়গায় যাওয়া।

(১৩) দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করে নিজের মত প্রকাশ করা।

(১৪) চুপ করে না থেকে নিজে থেকে কথোপকথন শুরু করা ও চালিয়ে যাওয়া।

(১৫) বাইরে একা একা না যেয়ে দল বেধে যাওয়া।

(১৬) ক্লাসে যে প্রশ্নের উত্তর জানা নেই সেই প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নেওয়া।

(১৭) আমি যখন জানবো যে ওখানে অনেক লোকের সমাগম ঘটবে তখন সেখানে যাবো।

এবারে সামাজিক ভীতি সম্পর্কিত নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করুন এবং উত্তরগুলো লিখে ফেলুন।

(১) উদ্বেগ বা নার্ভাসনেস তৈরি হয় এমন কার্যকলাপ, পরিস্থিতি ও অবস্থান চিহ্নিত করুন। কোথায় নার্ভাস বোধ করছেন এবং তখন আপনি কী করছেন? কী ধরনের উদ্বেগ বা ভয়ের কথা বিবেচনা করে প্রকৃত পরিবেশকে এড়িয়ে চলছেন?

(২) আপনার ভয়গুলো কী? এ সম্পর্কে একটু গভীরভাবে চিন্তা করে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করুন।

ক) এই পরিস্থিতিতে কোন কোন বিষয় আমার জন্য সমস্যা তৈরি করছে?

খ) এখানে আমি কোন বিষয়টাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি বা কী নিয়ে মানসিকভাবে অশান্তি বা অস্বস্তি ভোগ করছি?

গ) কী জাতীয় খারাপ ঘটনার আশঙ্কা করছি?

ঘ) খারাপ কিছু ঘটলে আমার কী কী ক্ষতি হতে পারে?

উপরের প্রশ্নের উত্তর থেকে নিজের বা পরিবেশ থেকে যেসব খারাপ চিন্তা উঠে এসেছে সেগুলোকে সহনীয় পর্যায়ে আনার জন্য কতগুলো ধাপ নীচে উল্লেখ করা হলো।

অনুভূতিগুলোর ধরন এবং মাত্রা নির্ধারিত হয় কোন ঘটনা, পরিস্থিতি এবং ঘটনা সম্পর্কে ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার দ্বারা। খারাপ অনুভূতি বদলানো বা সহনীয় পর্যায়ে আনার জন্য চিন্তার পরিবর্তন করতে হবে। নীচে চিন্তা পরিবর্তন করার পাঁচটি ধাপের বর্ণনা করা হলো।

(১) চিন্তাগুলো খুঁজে বের করে লিখে ফেলতে হবে। চিন্তা ও অনুভূতি একে অন্যের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই চিন্তাগুলোই দৈনন্দিন কাজকর্মে খারাপ অনুভূতিগুলোকে উস্কে দিচ্ছে।

(২) এবারে এই চিন্তাগুলোর সাথে নিজেকে কীভাবে জড়িয়ে ফেলছেন অথবা নিজের মতো করে কী অর্থ দাঁড় করাচ্ছেন তা আলাদা করে লিখে ফেলুন। এটা আপনাকে আপনার মনের ভেতর কী চলছে অথবা কী অটোম্যাটিক থট আসছে তা চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে।

এক ও দুই নম্বর ধাপ ভালো করে বিশ্লেষণ করুন। যে চিন্তাগুলো লিখেছেন তার মধ্য থেকে ভুল, অপরিষ্কার, অস্পষ্ট, ভাসাভাসা চিন্তাগুলো খুঁজে বের করে বার বার দেখুন। ত্রুটিপূর্ণ চিন্তার তালিকা, যা নীচে উল্লেখ করা হবে, তার সাথে আপনার চিন্তাগুলো মিলিয়ে নিন।

নিজে নিজে এই ত্রুটিপূর্ণ বা অস্পষ্ট চিন্তাগুলোর বিকল্প বাস্তবসম্মত, যথাযথ, নির্ভুল চিন্তা খুঁজে বের করুন। এই চিন্তাগুলোকে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে সেগুলো প্রয়োগ করার চিন্তা করুন। এর ফলে বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতিতে আপনি আরো গভীরভাবে এবং সঠিকভাবে চিন্তা করার পথ খুঁজে পাবেন।

(৩) আগের ধাপে খুঁজে বের করা নতুন চিন্তাগুলোকে আরো শক্তিশালী করতে সেগুলো বার বার আওড়াতে হবে, একা একা অভিনয় করতে হবে। এভাবে এক সময় বাস্তব পরিস্থিতিতে সঠিক, সুস্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত চিন্তা করতে সক্ষম হবেন।

নিগেটিভ অটোম্যাটিক থট বা নেতিবাচক/খারাপ চিন্তা এবং আচরণ কীভাবে একে অন্যের সাথে ওতপ্রোত তা খুঁজে বের করতে হবে। বাস্তবসম্মত ও সঠিক চিন্তাগুলো বার বার স্মরণ করতে হবে। নতুনভাবে চিন্তা করতে হবে বার বার।

কোন ব্যক্তি যখন চাপে পড়ে, তার মুখ যখন লাল হয়ে যায় তখন উদ্বিগ্ন আর নিরুদ্বিগ্ন ব্যক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই লক্ষণগুলো অন্যরা খেয়াল করে না। মুখ লাল হয়ে যাওয়া, শরীর কাঁপা, ঘাম হওয়া - এগুলো খুব সাধারণ লক্ষণ। এগুলো যে কোন সময়, যে কোন কারণে যে কোন সুস্থ ব্যক্তির হতে পারে। অন্য কোন ব্যক্তিই এগুলো খেয়াল করে না। তাদের খেয়াল করার সময়ই নেই। সুতরাং বলা যেতে পারে, এ ধরনের লক্ষণ কোন সমস্যাই নয়, এটা এক মনগড়া বিশ্বাস। বরং, এ অবস্থায় এসব লক্ষণ লুকাতে গিয়ে যে আচরণ করা হয় সেগুলোই সবার চোখে পড়ে। যদি অন্যের মূল্যায়ন বা কে কী ভাবলো বা ভাববে তা উপেক্ষা করে নিজের কাজ নিজের মতো করে চালিয়ে নেয়া যায় তবে অনেক বেশি স্বস্তি, শান্তি বা আরাম বোধ করা সম্ভব। আর মনে রাখা প্রয়োজন, এসব শারীরিক লক্ষণ শুধু ভয়ের বা উদ্বেগের জন্যই হয়, তা নয়। অন্য যে কোন ধরনের আবেগের (যেমন আনন্দ, উত্তেজনা) ক্ষেত্রেও এ ধরনের লক্ষণ প্রকাশ পায়। যারা এ ধরনের সমস্যায় ভুগছেন তারা মিলিয়ে দেখবেন বিষয়গুলো এবং আশা করছি তারা কিছুটা হলেও উপকৃত হবেন।

শবনম কলি এ্যানি
এম.ফিল. (প্রথম পর্ব), চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়